দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 NOV 2007...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫ .....

বাংলাদেশে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষাব্যবস্থা

আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশে শিক্ষা জগতের এক নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন পালিত হবে। সেটি হবে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল বা আনন্দ কম্পিউটার মাধ্যম স্কুলের নবম জন্মদিন। ১৯৯৯ সালের এই দিনে এ ধরনেরই একটি স্কুলের জন্ম হয়েছিল ঢাকার কাছের গাজীপুরের ছায়াবিথী নামক স্থানে। সেই ঘটনার আট বছর পর ২০০৭ সালে চারপাশে তথ্যপ্রযুক্তির যখন তীব্র সঙ্কট, তখনও দেশের কোণায় কোণায় বিরাজ করছে এমন ১৫টি মাল্টিমিডিয়া স্কুল। সম্ভাবনা হচ্ছে ২০০৮ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরও অন্তত দু'টি এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার আটটি বছর পর এই সব স্কুলের কোন কোনটি এরই মাঝে সেই এলাকার সেরা স্কুলের সুনামও অর্জন করেছে। অতি নীরবে চরম লো প্রোফাইল নিয়ে এই স্কুলগুলো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অতি ক্ষুদ্রভাবে হলেও ঘোষণা করেই চলেছে একুশ শতকের নতুন শিক্ষাপদ্ধতির আগমনী বার্তা। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি এই ভেবে যে, কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহারকারী এই স্কুলগুলোর সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক গভীরভাবে আছে। ১৯৯৯ সালে গাজীপুরের ছায়াবিথীতে দেশের বরেণ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ও তাঁর পত্নীর হাতে যে স্কুলের গোড়াপত্তন, সেই স্কুলগুলোই এক ধরনের নতুন শিক্ষাব্যবস্থার আগমনী বার্তা প্রচার করে চলেছে পুরো দেশবাসীর কাছে। এটি এখনও এমন নয় যে, এই স্কুলগুলো জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মূলস্রোত হয়ে উঠেছে। এটি এখনও নয় যে, এই স্কুলগুলো শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। খুব সহজে এটি হবার নয় বলেই মনে করা উচিত। কিন্তু তবুও এটিই সত্য যে, আট বছর ধরে এই স্কুলগুলো একটি নতুন পথের ঠিকানা প্রদর্শন করে চলেছে। দেশের জরাজীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন জীবন দানের এই পদ্ধতিটি অদূর ভবিষ্যতেই যে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে আর কারই সন্দেহ থাকুক, আমার অন্তত নেই। আমি এটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, মাল্টিমিডিয়া স্কুল যে ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে আগামীদিনের শিক্ষাব্যবস্থা। এই কথাগুলো অনেকের জন্যই এখনও বিশ্বাস করা কঠিন হতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাসটি তেমনি। এই বিশ্বাসের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। আছে একটি সৃষ্টির গল্প। সেই গল্পটি বিশ বছরের পুরানো, তবে দু'টি ভাগে বিভক্ত। গল্পের শুরুটা ১৯৮৭ সালে যখন জন্ম নিয়ে জীবন ধারণকারী হয়েও আমি কম্পিউটারের বোতাম স্পর্শ করি তখন থেকে। সাধারণ কম্পিউটার দিয়ে মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ করতে পারায় যে নতুন পৃথিবীর পথে আমরা পা বাড়াই সেটিই দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ হয়ে আসছে। তখনই আমার সাথে পরিচয় হয় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামক ঢাকার একটি আন্তর্জাতিক ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের। আমি এক কথায় অভিভূত হই এটি জেনে যে, আমেরিকার শিশুরা ১৯৭৬ সালে এ্যাপল কম্পিউটার বা বাণিজ্যিক পিসির জন্মের পর থেকেই এই যন্ত্রটিকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এর নেতৃত্ব দেয় এ্যাপল। কালক্রমে এ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি তাদের এ্যাপল-১, এ্যাপল-২, এ্যাপল-২ জিএস, এ্যাপল-৩ এসব কম্পিউটারের পর আমেরিকার শিশুদের হাতে প্রদান করে যুগান্তকারী মেকিন্টোস কম্পিউটার। অবশ্য ৮৭ সালে ঢাকার আমেরিকান স্কুলে এ্যাপল সিরিজের কম্পিউটারই বেশি প্রচলিত ছিল। ঐ সব কম্পিউটারে তখন প্রো ডস অপারেটিং সিস্টেম চলত। সেই প্রো-ডসের সাথেই তখন যুক্ত হয় হাজার হাজার শিক্ষামূলক সফটওয়্যার। যদিও সেই সব সফটওয়্যারে এখনকার মতো এত ব্যাপকভাবে ইন্টারএ্যাকটিভিটি ছিল না, তথাপি শিক্ষায় কম্পিউটারকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার শুরুটা সেই কম্পিউটারগুলো দিয়েই। এর পর আসে ম্যাক। ম্যাকে এ্যাপলের হাইপার কার্ড প্রযুক্তি আসে প্রথম। তখন থেকেই শিক্ষায় কম্পিউটারের ইন্টারএ্যাকটিভিটির সূচনা হয়। এর পর ম্যাক্রোমিডিয়া (বর্তমানে এ্যাডোবি) ডিরেক্টর দিয়ে তৈরি হাজার হাজার সফটওয়্যারই একদিন শিক্ষার বিপ্লব বয়ে আনে। এর ফলে আমেরিকার সর্বত্র স্কুলের শিক্ষায় প্রাণের নতুন বন্যা প্রবাহিত হয়।

বাংলাদেশেও আমরা অনুভব করি যে, প্রচলিত শিক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে। আমাদেরকে পা ফেলতে হবে পরের সিঁড়িতে। এর পর বাংলাদেশে এই গল্পের পরবর্তী স্তরের সূচনা হয়। সেটি ঘটে ১৯৯৭ সালে, প্রথম ঘটনার ঠিক দশ বছর পরে। এবার যখন প্রথম গল্পের দুই সপ্তাহ ড্রিঙ্ক দিয়ে সভার কাজ চলত। সদস্যরা প্রধানত তাঁদের কম্পিউটিং অভিজ্ঞতা বিনিময় করত। আমরা সফটওয়্যারও বিনিময় করতাম। ব্যাপারটা অনেকটা সত্তুর দশকের আমেরিকায় হোমব্রিউ ক্লাবের সভার মতো। বব টরিনের পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমরা আমেরিকান স্কুলে দেশের প্রথম কম্পিউটার মেলার আয়োজন করতে সক্ষম হই। বিসিএসের সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ এইচ কাফি ও মহাসচিব মুনিম হোসেন রানা আমাদের এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। আমেরিকান স্কুলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা দুনিয়া জোড়াই মেকিন্টোস কম্পিউটার ব্যবহার করত। সেই সময়ে একমাত্র আমি ছাড়া বাংলাদেশে মেকিন্টোস কম্পিউটারের জন্য খুব ভাল সাপোর্ট আর কেউ দিতে পারত না। আমার সাথে আমেরিকান স্কুলের সার্ভিস কন্ট্রাক্ট ছিল। সেই সুবাদে প্রায়ই আমি ঐ স্কুলে যেতাম। কম্পিউটার ঠিক করার প্রতি আমার নিজের কোন ঝোঁক না থাকলেও আমি যেতাম এই স্কুলের ল্যাবে কম্পিউটার ব্যবহার করে যে শিক্ষা দেয়া হতো সেটি উপলব্ধি করতে: যদি বলা হয় যে, কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার ধারণাটা আমি কোথে কে পাই, তবে অবশ্যই আমেরিকান স্কুলের কথাই স্মরণ করতে হবে। এর পর আমাদের পারিবারিক জীবনে ঘটে একটি অনবদ্য ঘটনা। ১৯৯৭ সালের নবেম্বর মাসে ঢাকার শেরাটন হোটেলে বিসিএসের কম্পিউটার মেলা চলাকালে প্যাকার্ড বেল নামক একটি মার্কিন কোম্পানির আমন্ত্রণে আমি আমেরিকার লাসভেগাসের কমডেক্স ফল দেখতে যাই। বলার অপেক্ষা রাখে না, সেই মেলা দেখার ফলে আমার কম্পিউটার বিষয়ের প্রচলিত ধারণাই বদলে যায়। আমাদের দেশে তখন সকলের কাছেই কম্পিউটার মানেই হলো কেবলমাত্র বাণিজ্যিক টুল। আমিই একমাত্র লোক, যে কম্পিউটারকে পাবলিশিং টুল হিসেবে ব্যবহার করছি। আমেরিকায় গিয়ে দেখলাম, সেটি কেবল পাবলিশিং টুল নয়, লাসভেগাসের কম্পিউটার স্টোরের পুরো দোকানজুড়ে গ্রাফিক্স-মাল্টিমিডিয়া ও শিক্ষামূলক সফটওয়্যার থরে থরে সাজানো। আমেরিকা থেকে শিশুদের জন্য উপহার হিসেবে আনার মতো কিছু পাইনি। আমি আমার ছেলে বিজয়ের জন্য ৫০ ডলার দিয়ে দশটি সিডির একটি প্যাকেট কিনলাম। সেটি ঢাকায় এনে দেখলাম যে, সে এক অনন্য জগত। সেই সফটওয়্যার সিডিগুলো বিজয় এত চমৎকারভাবে ব্যবহার করল যে, সেই জ্ঞান নিয়ে সে গ্রীনহেরাল্ড স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিল এবং সেখানে ভর্তির জন্য টিকে গেল। অন্য শিশুরা ভর্তি হবার জন্য বছর দুয়েক যাবৎ কোচিং করেছে—কিন্তু বিজয়ের কোচ ছিল সেই সফটওয়্যারগুলো। আমি বিজয়কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, সফটওয়্যারে যা আছে তা-ই তার পরীক্ষায় ছিল। এর ফলে আমি মনে মনে নিশ্চিত হলাম যে, কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবেই ব্যবহার করতে হবে। সেই সময়ই আমি এ্যাপলের শিক্ষামূলক সফটওয়্যারগুলোর বিষয়ে খোঁজখবর নিতে লাগলাম। আমেরিকার কিছু কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে সরাসরি সেই সব সফটওয়্যার আমদানি করলাম আমি। ঐ সফটওয়্যারগুলো নিয়ে আইডিবিতে অনুষ্ঠিত ১৯৯৮ সালের বিসিএস কম্পিউটার মেলায় হাজির হলাম। বিস্ময়করভাবে সেই মেলায় সফটওয়্যারগুলো ব্যাপক আলোড়ন তুলে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের কম্পিউটার অনুষ্ঠানেও আমি শিক্ষায় কম্পিউটারের ব্যবহার নিয়ে অনুষ্ঠান প্রস্তুত করে প্রচার করি। সেই ভাবনা থেকেই গাজীপুরের ইউসুফ আলী ফাউন্ডেশনের মজিবর রহমানের সাথে একটি মাল্টিমিডিয়া স্কুল স্থাপনের বিষয়ে কথা হয়। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর উদ্বোধন হয় সেই স্কুলের। গাজীপুর ছায়াবিথী থেকে সেই স্কুলের যাত্রা। নাম ছিল আনন্দ মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার স্কুল। সম্ভবত মাত্র ১৩ শিশু নিয়ে প্রথম বছরে যাত্রা করে সেই স্কুলটি। ২০০০ সালে ঐ একটি মাত্র স্কুলই মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষাদানের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখে। এর পর ২০০০ সালজুড়ে আমি পুরো দেশে এই ধারণা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হই। এর পর স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

প্রথম প্রজন্মের মাল্টিমিডিয়া স্কুল

২০০০ সালে মাত্র একটি স্কুল চালু হলেও ২০০১ সালে মোট ১০টি আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল চালু করা হয়। গাজীপুর ছাড়া নতুন স্কুলগুলো